এই লেখাটি 'মনভুবন' এর ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রামাঞ্চলের মানসিক রোগের দশা ও মনস্তত্ত্ব

প্রায় আড়াই হাজার বছর পুর্বে, মানুষ তার মন সর্ম্পকে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে শত শত মতবাদ ও বিতর্কের পরও মানুষ তার মনের অস্তিত্ব খুজে না পাওয়ায়, তারা মানব-কার্যকলাপকে পুঁজি করে এগিয়ে যায় মানব মনের সন্ধানে। মানব-কার্যকলাপকে আচরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এবং এই আচরণের উপর অসংখ্য তত্ত্ব ও মতবাদের মাধ্যমে মানুষ এগিয়ে যেতে থাকে তার লক্ষ্যে। অবশেষে ১৮৭৫ সালে, "উইলহেম উন্ড" লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও "উইলিয়াম জেমস" হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক পৃথকভাবে দুটি গবেষণাগার স্থাপন করলে মনতত্ত্ব নতুনভাবে এক বৈজ্ঞানিক যাত্রা শুরু করে। সাথে সাথে এরিকসন, কারেন হর্নি, আডলার , ইয়াং ও ফ্রয়েড সহ অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু মহামানবের তত্তের প্রবর্তনে মানুষ তার মনকে এমন ভাবে বুঝতে পারে যে, মানব-মন যেন অনুভবে হাতের কাছে। ১৯১৩ সালে ওয়াটসন বলেন, "মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান"। এসব তত্ত্ব ও গবেষণার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে মানব আচরণের বিকৃতির কারন তথা মানসিক রোগের তত্ত্ব। এখন মানুষের তথা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে পরিস্কার যে মানব আচরণে কেন বিকৃতি ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের (এমনকি শহরের অনেক মানুষ) মধ্যে মানসিক সমস্যা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান।

ভুল ধারণাগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়স থেকেই বাচ্চাদের অন্ত-করনে গঠিত হতে থাকে। আর এসব গঠিত ভুলধারনা-গুলো চুড়ান্তরূপ নেয় ব্যাক্তি যখন পুরোপুরি পূর্ণতা লাভ করে

ভ্রান্ত ধারণা: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের মানসিক রোগ সমন্ধে ধারণা জানতে আগ্রহী হয়েছিলাম। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের সাথে কথা বলে এবং এ সমন্ধে পি. এইচ. ডি থিসিস গুলোর মাধ্যমে জানা যায় যে, তারা এসব রোগের কারণ হিসেবে জিন ভুতের আসর ও অন্যান্য ভ্রান্তবিশ্বাসে কঠোরভাবে বিশ্বাসী। এসব অদৃশ্য শক্তির একটি কল্পিত রূপ তৈরি করে তারা তাদের নামে বলি, মানত, উৎসর্গ করে থাকে। তারা এসব রোগের চিকিৎসা করে তথাকথিত ওঝা ও কবিরাজ এর কাছে। এসব ছদ্মবেশি 'চিকিৎসক' মানুষদের নানাভাবে ধোকা দিয়ে টাকা আয় করে কিন্তু রোগের কোন সুরাহা হয় না। আর যারা এসবে বিশ্বাস করে না তারাও কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে না এসে, চিকিৎসা নেয় মেডিসিন বিশেষজ্ঞের কাছে শুধুমাত্র শারীরিক লক্ষণের জন্য; ফলে তারাও যথাযথ সমাধান পায় না।

ভ্রান্তবিশ্বাসের বিভিন্ন রূপ: আগেই বলেছি, মানুষ কিছু কল্পিত অদৃশ্য শক্তির বিশ্বাস করে। এবং তারা মনে করে এসব শক্তি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। যেসব রূপে মানুষ বিশ্বাস করে, তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

ভুত: ভুতের পেছন দিকে পা থাকে। সে উড়ে বেড়াতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুর রূপধারণ করতে পারে। এবং মানুষের প্রতিটি শিরা ও উপশিরার চলাফেরা করতে পারে। ইচ্ছা হলে মানুষকে তার কথামত চালাতে পারে।

সাপ: সাপের রাণী, এরা সাপের রূপে মানুষকে ছোবল দেয় অথবা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে অসুখ তৈরি করে।

পেতনি: এটা ভুতের মতই তবে মহিলা ভুত এবং খুবই রাগী।

কালী: কালী হলো হিন্দু দেবী কালীর প্রতিরুপ। কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ নাপাক থেকে কালীর থানের পাশদিয়ে হেটে গেলে কালী ব্যাক্তিকে ধরে ফেলে এবং শাস্তি দেয়।

জলহরী: জলে থাকে যে ভুত তাকে জলহরী বলে উল্লেখ করে থাকে ভ্রান্তবিশ্বাসে বিশ্বাসী গ্রামের মানুষ। কেউ জলে প্রস্রাব করলে, না জেনে জলহরীকে লাথি মারলে জলহরী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে তার শরীরে অবস্থান করে।

এছাড়াও রাক্ষসী, চুলহী, ডাইনি, ভুতনী সহ অসংখ্য কল্পিত রূপে মানুষ বিশ্বাস করে থাকে। তাই তারা রোগের আসল কারণ সর্ম্পকে জানতে চায় না। ফলে গ্রামের অসংখ্য মানুষ এসব মানসিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাছাড়া ওঝা ও কবিরাজ কর্তৃক মানসিক রোগের যেভাবে চিকিৎসা করা হয় তা রোগীর সমস্যা দূর না হয়ে বরং তাদের শারীরিক সমস্যা নতুন করে যুক্ত হয়'। কেননা এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে গিয়ে, অধিকাংশ সময় রোগীকে আঘাত করা হয় এবং মনে করা হয় যে আঘাত রোগীর গায়ে করা হলেও তাতে সে ব্যাথা পায় না কারণ তার শরীরে যে অবস্থান করছে তাকে আঘাত করা হচ্ছে।

ভ্রান্তধারণা থেকে মুক্তি: বাংলাদেশে হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মানসিক রোগ নিয়ে কাজ করলেও মানুষকে সচেতন করায় জন্য কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। এমনকি মনোবিজ্ঞান বিষটি এখনো পযর্ন্ত কলেজে ঐচ্ছিক বিষয়। যেখানে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই মনোবিজ্ঞানের ধারনা নিয়ে একটি আবশ্যক বিষয় হিসেবে সিলেবাসে অর্ন্তভূক্ত করা উচিৎ। কেননা ভুল ধারণাগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়স থেকেই বাচ্চাদের অন্ত-করনে গঠিত হতে থাকে। আর এসব গঠিত ভুলধারনাগুলো চুড়ান্তরূপ নেয় ব্যাক্তি যখন পুরোপুরি পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু তা না করে বরং বাচ্চাদের মজাদার বিষয় হিসেবে ভুতের গল্পসহ বিভিন্ন অবাস্তব ধারণা সৃষ্টিকারী গল্পপড়ানো হচ্ছে যার ফলে তারা অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে এবং তারা আসল ধারণা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সিলেবাসে মনোবিজ্ঞান বিষটি অন্তর্ভূক্ত করার পাশাপাশি, সাধারন মানুষ যাতে মানসিক রোগ সর্ম্পকে ধারণা পেতে পারে তার জন্য সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। এ ব্যপারে মনোবিজ্ঞানীদের সাথে নিয়ে সরকার মিডিয়ার মাধ্যমে তা করতে পারে। শুধু সচেতনতা বৃদ্ধি করলে হবে না সাথে সাথে মানুষ যেন এসব রোগের সুসমাধান পায় সে ব্যাপারে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের প্রত্যেক (কমপক্ষে) উপজেলা পর্যায়ে মনোবৈজ্ঞানিক সেবা কেন্দ্র খোলা উচিৎ। কিন্তু দূর্ভাগ্য হলেও সত্য, দেশের মাত্র চারটি সরকারী (ঢাকা, রাজশাহী, জগন্নাথ ও চট্টগ্রাম) বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও, ঢাকা ছাড়া অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা নেই। আমি মনে করি, মানুষের স্বার্থে এমনকি ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য হলেও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে কাউন্সেলিং সেন্টার খোলা উচিত। সার সংক্ষেপে বলা যায়, এসব ভ্রান্ত ধারনা এবং মানুষকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সিলেবাসে মানসিক রোগ ও ভ্রান্ত ধারণা সর্ম্পকে অন্তত কয়েকটি প্রবন্ধ অর্ন্তভূক্ত করতে হবে, উচ্চ মাধ্যমিক পযার্য়ে সিলেবাসে মনোবিজ্ঞান বিষয়টিকে বাধ্যতামুলকভাবে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে, প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র খুলতে হবে। আমি মনে করি উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে।

নাসিম রানা মাসুদ, ৩য় বর্ষ, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।